



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 07 - 15

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মহাভারতে নারীর অবস্থান ও অস্তিত্ব : প্রসঙ্গ গান্ধারী

পৌলমী কোনার

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : paulamikonar2015@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Mahabharata,
Women,
Gandhari,
Dhritarashtra,
Duryodhana,
Mahakavya,
Vyasadeva,
Position,
Existence,
Mother.

Abstract

The Mahabharata, as a colossal and timeless Indian epic, intricately weaves philosophical, social, and ethical narratives, where women are not only present as symbolic figures but also as central forces of transformation and resistance. This essay focuses on Gandhari, a prominent yet often overshadowed character, to explore the nuanced portrayal of women's position and existential agency within the epic's deeply patriarchal framework.

Gandhari, the daughter of King Subala of Gandhara, marries the blind prince Dhritarashtra and chooses to blindfold herself permanently—a decision that, while celebrated as an act of supreme marital devotion (pativrata), is critically analyzed in this essay as a profound gesture of self-effacement imposed by societal expectations. Her silence in moments of moral crisis—such as Draupadi's disrobing and the unjust game of dice—serves as a testament to the normalized suppression of female voices in epic literature.

The essay reveals how Gandhari's identity as wife, mother, and queen is continuously shaped and constrained by external forces—her husband's blindness (literal and moral), her son Duryodhana's unchecked ambition, and a royal court that renders her voiceless. Despite being conscious of dharma, Gandhari is repeatedly sidelined by the very men she remains loyal to. Her emotional and ethical protests—particularly toward the end of the Sabha Parva—emerge as too late and too subdued within the greater machinery of fate and male dominance.

Gandhari's motherhood is portrayed as both sacred and sorrowful. The birth of a lump of flesh after two years of pregnancy, followed by the creation of one hundred sons, is examined here as a symbolic embodiment of emotional void and unfulfilled desires. Her maternal grief culminates in helplessness during the fall of her lineage.

By drawing from Vyasa's epic, Bengali literary critiques, and modern feminist interpretations, the essay argues that Gandhari is less a passive figure and more a tragic archetype—bound by duty, stripped of agency, and yet harboring deep moral insight. Her character reflects the paradox of being revered and yet unheard, illustrating how epic narratives glorify female sacrifice while silencing their struggles. Gandhari's journey compels a re-evaluation of how

mythology encodes—and often confines—women's roles in history and collective memory.

Discussion

মহাভারত প্রাথমিক মহাকাব্য, মহাভারত নৈর্ব্যক্তিক মহাকাব্য। মহাভারত শুধুমাত্র বৃহত্তম মহাকাব্য নয়; ভারতীয় জনজীবনে এই সুবিশাল গ্রন্থটির ধর্ম, নীতি, ইতিহাস ও সমাজচেতনার প্রভাব অপরিসীম। ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ মহাকাব্যদুটি ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রাণস্পন্দনকে ধরে রেখেছে। পরিবর্তনের স্পর্শে বাঙালি মন ও মননে উনিশ শতক থেকেই ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর মতো সুবিশাল নৈর্ব্যক্তিক মহাকাব্যকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রবণতা শুরু হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের রামায়ণচর্চা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে নতুনতর ঢেউ উঠেছিল তা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে পুরাণ-মহাকাব্য চর্চার এক আধুনিক রশ্মিতে আলোকিত করে চলেছে। প্রকৃত পাঠকের মতো প্রকৃত লেখক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ না করে যুগ যুগ ধরে সনাতন ভারতীয় মনে গড়ে ওঠা মূর্তিগুলির অন্তর্বর্তী গুণ-নৈতিকতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সামনে আনতে পিছপা হননি। উনিশ শতক থেকেই মহাকাব্যের চরিত্রগুলিতে ভর করে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় খুঁত ও ক্ষতগুলির চর্চায় বাঙালি আগ্রহী হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য –

“আধুনিক পাঠকের চোখে রাম রীতিমতো অ-রাম হ’য়ে ওঠেন তার সীতাবর্জনের সময়। অগ্নিপরীক্ষা তো সীতার নয়, রামের, আর সে-পরীক্ষার বিচারক আমরা।”^১

আধুনিক লেখকের কলমে মহাকাব্যের চিরায়ত চরিত্রগুলি ভিন্ন অবস্থানে, ভিন্ন পরিসরে বিশ্লেষিত হয়ে চলেছে। উনিশ শতক থেকে সমাজে নারীর অবস্থান ও অস্তিত্বের রূপান্তরের চর্চায় স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যে পূর্ববর্তী নারীচরিত্রগুলির অনুসঙ্গ আলোচিত হয়ে চলেছে। নারীর অবস্থান ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান আসলে নারীর বিবর্তনের ইতিহাসের অনুসন্ধান, সর্বোপরি সমগ্র সমাজ-ইতিহাসের অনুসন্ধান –

“মানুষ যখন সত্যকার, একলা, ইতিহাস তাকে ছুঁতে পারে না। একক মানুষের অস্তিত্ব আছে; ইতিহাস নেই। ...বক্তব্য এই যে, নিঃসঙ্গ মানুষ ও সামাজিক মানুষ আবহমানকাল পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; ইতিহাস শুধু সামাজিক মানুষেরই জীবনব্যাপ্য।”^২

মহাভারতের মতো সুপ্রাচীন এবং সুমহান মহাকাব্যের বিশালতায় একক মানুষের অবস্থান গৌণ, মহাকাব্যে ঘটনাই মুখ্য। তবু এই বৃহত্তম মহাকাব্যে বিভিন্ন পটভূমিকায় দীপ্তিময়ী নারীচরিত্রগুলির সমাবেশ ঘটেছে – তাঁরা কন্যা-জায়া-জননী; আবার তাঁরাই কখনও নিয়ন্তা। সত্যবতী, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী, উর্বশী, অদিতি, শকুন্তলা, হিড়িম্বা, সুভদ্রা, সুদেষ্ণাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। তাঁরা কেউ রাজমাতা, কেউ সুরূপা রাজকন্যা, কেউ মনমোহিনী অঙ্গরা, কেউ শক্তিময়ী রাক্ষসী। তবুও মহাকাব্যের কাহিনি পারস্পর্যে তাঁদের জীবনে গিরিসংকট উপস্থিত হয়েছে। মহাকাব্যের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। তবু মহাকাব্যের চরিত্রগুলি অনুভূতির উর্ধ্বে নয়, কখনোই তাঁদের সুখদুঃখাদির বোধ সাধারণ নারীর থেকে আলাদা নয়।

মহামুনি ব্যাসদেব অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে যথার্থ কাহিনি পারস্পর্য রক্ষা করে গান্ধারীকে মহাভারত মহাসাগরে নিমজ্জিত করেছেন। গান্ধারদেশের পরমা রাজকন্যার অবস্থানকে মহাকাব্যের প্রয়োজনে অবলীলায় পৌর্বাপর্য কাহিনি গ্রন্থের সুতোয় সুসজ্জিত করেছেন। মহাভারত এক মহাবৃত্ত, আর এর অন্তর্গত প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা এই মহাবৃত্তের কেন্দ্রের টানে সদা ঘূর্ণায়মান। মহাভারতের কেন্দ্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং পরিণামে ধর্মের সংস্থাপন। ধর্মস্থাপনের এই রক্তক্ষয়ী, বিনাশক, হৃদয়ভেদী কাহিনিমালায় রাজকন্যা গান্ধারী, স্ত্রী গান্ধারী, মাতা গান্ধারী এবং সর্বোপরি নারী গান্ধারীর অস্তিত্ব সংকট ঘনীভূত হয়েছে বহুবার। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার রাজ্যের অধিপতি রাজা সুবলের কন্যাই গান্ধারী। পিতা এবং পিতৃভূমির পরিচয়েই মহাভারতে তাঁর নামকরণ হয়েছিল। অষ্টাদশ পর্বব্যাপী মহাভারতে তাঁর অন্য কোনো নামোল্লেখ নেই।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর ভীষ্ম ধর্মানুসারে কুরুরাজ্য রক্ষা করতে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর জন্মকাল থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানেই বড় হচ্ছিলেন। মহামহিম ভীষ্ম তাঁদের পুত্রের মতো লালন করে সর্বগুণে নিপুণ ও অভিজ্ঞ করে তুলতে প্রয়াসী হন। সেই সময়ে ভূমণ্ডলে নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দেবব্রত ভীষ্ম সর্বজনবিদিত পরম ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে সুবলনন্দিনী গান্ধারীর সমস্ত বৃত্তান্ত এবং ভূয়সী প্রশংসা শুনে গান্ধাররাজ সুবলের কাছে কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। পাত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ন হলেও গান্ধাররাজ সুবল আপন বুদ্ধিতে পাত্রের বংশ, যশ, ধনাদি পর্যালোচনা করে ধর্মপরায়ণা কন্যাকে তাঁর হাতেই সমর্পণ করেন –

“কুলং খ্যাতিঞ্চ বৃত্তঞ্চ বুদ্ধ্যা তু প্রসমীক্ষ্য সঃ।

দদৌ তাং ধৃতরাষ্ট্রায় গান্ধারীং ধর্মচারিণীম্।।১২।।”^৩

এর ঠিক পরেই ব্যাসদেব যে শ্লোক দুটি রচনা করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তার বাংলা অনুবাদ করেছেন –

“তদনন্তব, গান্ধারী শুনিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, অথচ পিতা ও মাতা তাঁহার হস্তেই আপনাকে দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।।১৩।। তাহার পর, ‘আমি পতিকে অতিক্রম করিব না’ এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া পতিব্রতার্থিনী গান্ধারী একখানি পটবস্ত্র লইয়া তাহাকে অনেক ভাঁজ করিয়া, তাহা দ্বারা নিজের নয়নযুগল বন্ধন করিলেন।।১৪।।”^৪

স্বয়ং মহাভারতকার অতীব নির্লিপ্তভাবে মহাভারতের চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন, তাই চরিত্রগুলিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই বহুপ্রকার জটিলতা এসেছে। অষ্টাদশ পর্বব্যাপী এই কাব্যের প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে দেশ-কালের অতীত – মহাভারত হয়ে উঠেছে শাস্ত্র জীবনের চিরায়ত কথামালা। মানুষের জীবন কখনোই শুধুমাত্র সত্য-শিব-সুন্দরের রূপায়ণ নয়। স্বভাবতই গান্ধারীর জীবনও সেরকম হয়নি। আসলে কেবল নারী নয়, সমাজবদ্ধ কোনো মানুষের জীবনেই পদে পদে নিপাট সুখ ও ঐশ্বর্যের চমক থাকে না। কিন্তু নিশ্চয়ই সুখ ও দুঃখের পরিমাণের তারতম্য থাকে। মহাভারত মহাবৃত্তে গান্ধারীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেছে ভাগ্য বিপর্যয়। গান্ধাররাজ সুবলের হস্তিনাপুরের নাম, যশ, ঐশ্বর্য, পরাক্রমে আগ্রহান্বিত হওয়া যতখানি স্বাভাবিক বিষয় ছিল, পিতা সুবলের পক্ষে সুন্দরী কন্যাকে জন্মান্ন পাত্রের হাতে সমর্পণ করা ততখানি সহজ ছিল না। সহজেই অনুমান করা যায় যে, জন্মান্ন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ কোনো পিতার পক্ষেই মনোগ্রাহী সিদ্ধান্ত হতে পারে না। আদরের রাজকন্যা প্রথম যখন ভাবী স্বামীর অন্ধত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন তা নিশ্চিতভাবেই আনন্দঘন মুহূর্ত ছিল না, বরং তা ছিল বিস্ময়ের – পূর্বোক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদের ‘অথচ’ শব্দ থেকেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। গান্ধারীর স্বাতন্ত্র্য এখানে নেই, এমনকি যাঁদের জন্য তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান মহাভারতে রইল না তাঁরা অর্থাৎ গান্ধারীর পিতা-মাতার স্বাতন্ত্র্যও মহাভারতে রক্ষিত হয়নি। আমাদের সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত পীড়িত হয়ে চলেছে একথা সত্যি, তবে অসংখ্য পুরুষও শোষিত, বঞ্চিত। সর্বোপরি মানুষ তার ভিন্ন অবস্থানে, ভিন্ন কারণে অসহায়। ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বুকুর পুরস্কার জয়ী লেখিকা বানু মুশতাক একটি সাক্ষাৎকারে মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনার, অসহায়তার কারণটিতে আলোকপাত করেছেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত মহাভারতের চরিত্রগুলি এই আধুনিক ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলেই মহাভারত মহাকাব্য। তিনি বলেছেন –

“শুধু যে মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করছে তা নয়, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতির চাপিয়ে দেওয়া অন্ধ আনুগত্যও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রতিনিয়ত এমন আঘাত হানছে যে, আমাদের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।”^৫

স্বামীকে কোনোদিন অতিক্রম করবেন না বলে এক নারী, বলা ভালো একজন মানুষ আমৃত্যু নিজের চোখদুটো পটবস্ত্রে বেঁধে ফেললেন। সামাজিক পরিকাঠামো স্বামীর চেয়ে স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট হতে নির্মমভাবে বাধা দেয়। বহু যুগ ধরে নারীও এই ভাবনাকে লালন করে চলেছে, প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে –

“তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল – তিনি যেন পতিব্রতা হইয়া থাকিতে পারেন এবং নিজের অপেক্ষা কখনও পতিকে অপকৃষ্ট মনে করিতে না পারেন।”^৬

সমস্যা এই জায়গাতেই। শুধুমাত্র নিজেকে পতিব্রতা প্রমাণ করতে গিয়ে একজন নারী মৃত্যু পর্যন্ত অন্ধকারকেই বেছে নিলেন, অথচ তিনি আলোর স্বাদ পেয়েছেন; তিনি জন্মান্ন ছিলেন না। দাম্পত্যের সূচনালগ্নেই নারী গান্ধারীকে শুধুমাত্র পতিব্রতার আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলতে গিয়ে স্বয়ং মহাভারতকার তাঁর সুন্দর চোখদুটিকে বেঁধে দিলেন। এখানে মহাকাব্যের মহান স্রষ্টা সমাজের চিরকালীন নিয়ম-নীতির স্বরূপটি অনাসক্ত হয়েই নির্মাণ করতে চেয়েছেন। সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে মোট চারটি আদি মহাকাব্য রয়েছে, যথা – ভারতীয় মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ এবং মহাকাব্য হোমার রচিত গ্রিক মহাকাব্য ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’। এই চারটি মহাকাব্যের মধ্যে ‘মহাভারত’ আয়তনে সর্ববৃহৎ। এই কাব্যের আয়তন ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’ কাব্যদ্বয়ের সম্মিলিত আয়তনের প্রায় দশগুণ এবং ‘রামায়ণ’-এর প্রায় চারগুণ। সুবিশাল এই মহাকাব্যে এবং পরিবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে আমরা বহু পতিব্রতা নারীর সন্ধান পাই, কিন্তু পত্নীব্রত পুরুষের সংখ্যা আক্ষরিক অর্থেই নামমাত্র। এমনকি ‘পত্নীব্রত’ বা ‘স্ত্রীব্রত’ শব্দের সঙ্গেও আমাদের তেমন সাক্ষাৎ হয় না। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এক অজ্ঞাত লেখক রচিত ‘বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা’ গ্রন্থে লঘু হাস্যরসের আড়ালে সম্ভবত প্রথম ‘স্ত্রীব্রত’ শব্দটি এক আধুনিক ভাবনার আলোকবর্তিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয় –

“পতিব্রতা নারীর পতি সেবাই হচ্ছে, প্রধান ধর্ম। সেইরূপ স্ত্রীব্রত স্বামীর স্ত্রী সেবাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্য কর্ম। স্ত্রীর সেবা কল্যেই সকল ধর্ম বজায় থাকে।”^৭

বর্তমানে একুশ শতকের আধুনিক জীবনেও নারীকে প্রতি পদে পদে পতিব্রতা হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, অথচ আধুনিক জীবনবোধে জারিত সমাজে পুরুষের ক্ষেত্রে এই উদাহরণ বিরল বললেই চলে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বাণী বসু সুবিশাল মহাভারতকে মিথকথার (Myth) আবরণ থেকে মুক্ত করে মানবিক এবং আধুনিক মনস্তত্ত্বের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন। মহাভারতের স্থান-কাল-চরিত্রের ব্যাপ্ত পরিসরকে উপজীব্য করে লেখিকা বৃহত্তর পটভূমিকায় রচনা করেছেন উপন্যাস সিরিজ। তবে বাণী বসু মহাশয়া নিজেই এই উপন্যাসগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বিদুর, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী প্রমুখ চরিত্রের বিচ্ছিন্ন রূপায়ণ নয়, বরং মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রকে তরবারি করে বৃহত্তম মহাকাব্যের কেন্দ্রে পৌঁছে নিজস্ব জীবনবোধে ভর করে নতুনতর ব্যাখ্যায় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর ‘ক্ষত্রবধূ’ উপন্যাসে তিনি ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারীর চক্ষুবন্ধন প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন –

“রাজপুরীসুন্দ নারীপুরুষ ভাবাচাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে থেকেই পুরস্ত্রী মহলে রব উঠল। মহাসতী, মহাসতী গান্ধারী।

খালি সত্যবতী আর দেবব্রতর মনে হল – জবরদস্তি দিয়ে কোনও শুভ কাজ হয় না। গান্ধারকুমারীর চোখের পটিটা কি বস্ত্রখণ্ডের? না, জমাট অভিমানের?”^৮

নারীর অন্তরে জমতে থাকে শত শতাব্দীর শাস্তি, তার আপন মানুষদের প্রতি শত শতাব্দীর অভিমান জমে পাহাড় হয়ে থাকে। আসলে এই অভিমান কোথাও যেন সমাজের নিয়ম-নীতি-পরিস্থিতির ইন্দ্রজালের প্রতিই।

গান্ধারী তাঁর স্বভাব এবং কাজের দ্বারা হস্তিনাপুরের রাজ অন্দরে এবং বাইরে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একদিন মহাভারতকার ব্যাসদেব ক্ষুধায় এবং পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে এলে গান্ধারী অতীব সযত্নে এবং নিপুণতার সঙ্গে তাঁকে যথোপযুক্ত সেবা করেন। ব্যাসদেব প্রীত হয়ে তাঁকে স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের মতো বলবান একশত পুত্রলাভের বরদান করেন। ক্রমে গান্ধারী গর্ভধারণ করেন, কিন্তু তারপর দুই বছর সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও সন্তান প্রসব হল না। পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর তেজস্বী পুত্রসন্তান প্রসবের সংবাদে গান্ধারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অজ্ঞাতসারে নিজের গর্ভপাত করান। দুই বছর ধরে পরম স্নেহে, মমতায়, আশায় তিনি গর্ভে যা লালন করেছেন তা লৌহপিণ্ডের মতো একটি মাংসপিণ্ড। মহাভারতে বর্ণিত পূর্ববর্তী স্বয়ং ব্যাসদেবের আশীর্বাদ বা পরবর্তী একশত পুত্রের জন্মের সমস্ত বৃত্তান্তকে এই মুহূর্তে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা যদি গান্ধারীকে একজন সাধারণ নারী হিসাবে দেখি, শুধুমাত্র একজন সাধারণ গর্ভবতী হিসাবে দেখি, তাহলেও তাঁর অপার যত্না এবং অসীম অপ্রাপ্তি অনুভবে এতটুকুও বিলম্ব হবে না। আর এইক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর মহামুনি ব্যাসের কাছে পাওয়া একশত পুত্রলাভের ভরসা যেমন ছিল, তেমনই তাঁর পুত্রদের হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন লাভ নিয়ে উদ্বেগও ছিল। একদিকে আশীর্বাদ ও ভরসা এবং অন্যদিকে দুশ্চিন্তা ও

উদ্বেগের পরিণতিতে একজন মায়ের অতিন্নেহে লালন করা গর্ভ থেকে মাংসপিণ্ড প্রসবের ঘটনা নিঃসন্দেহে হৃদয়বিদারক। এইখানে এসে গান্ধারীর মাতৃত্বের শোকাকর্ষক অনুরণন রবীন্দ্রনাথের মৃণালের মাতৃত্বের বার্থ্য প্রতিধ্বনিত সঙ্গ মিলে গেছে –

“আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। আমাকেও সে সঙ্গে যাবার সময় ডাক দিয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে সেই আমার জীবনে যা-কিছু বড়ো, যা-কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত; তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বস্তুম। মা যে এক সংসারের মধ্যে থেকেও বিশ্ব-সংসারের। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।”^৯

ধ্যানযোগে বেদব্যাস গান্ধারীর গর্ভপাত সম্পর্কে জানতে পেরে সত্বর সেখানে আসেন এবং তাঁর নির্দেশানুসারে একশোটি ঘৃতপূর্ণ কলসে একশো খণ্ডে বিস্তীর্ণ মাংসখণ্ড থেকে ক্রমে দুর্যোধন প্রমুখ শতপুত্রের জন্ম হয়। জন্মানুসারে পাণ্ডু এবং কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ হলেন। যেদিন ঘৃতপূর্ণ কলস থেকে দুর্যোধনের জন্ম হয় সেই দিন মহাবাহু ভীমেরও জন্ম হয়।

মহাভারতে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে স্বামীহারা কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনাপুরে ফেরার পর পুত্রহারা অশ্বালিকার হাহাকার; সত্যবতী, মহামহিম ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, পুরবাসী, দেশবাসীর হাহাকারের বহু চিত্র থাকলেও গান্ধারীকে কোথাও স্বামীহারা কুন্তীকে বা পিতৃহারা পাণ্ডবদের সাঙ্ঘ্য দিতে দেখা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সঙ্গে পাণ্ডবরা একসঙ্গে আনন্দে বড় হতে থাকেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম সব খেলায় সকলকে সহজে পরাভূত করতে পারতেন বলে বালকরা তাঁকেই প্রধান বলে গণ্য করত। ভীমের বিক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে দুর্যোধন ছলে-বলে-কৌশলে তাঁকে দমন করার উপায় সন্ধান করতে থাকেন। এরপর তিনি যখন বিষপান করিয়ে ভীমকে জলে ফেলে দেন তখন ভীম আটদিন নিখোঁজ ছিলেন। মহাভারতে সেই সময়কালে কুন্তী, বিদুর প্রমুখের উদ্বিগ্ন থাকার এবং যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেবের গোপনে ভীমের খোঁজখবর করার স্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু গৃহকর্ত্রী গান্ধারীকে একটিবারের জন্যেও ভীমের নিখোঁজ থাকার কারণে উদ্বেগ বা দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় না। পরিবারের এক সন্তান দীর্ঘ আটদিন নিখোঁজ, এমতাবস্থায় গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ববোধ জাগরিত হওয়া বা মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হওয়াটাই স্বাভাবিক, যেখানে আবার মহাভারতকার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন কুন্তীপুত্র ভীম এবং গান্ধারীপুত্র দুর্যোধনের জন্ম একই দিনে। এই বিপর্যয়ের সময়ে মহাভারতে কোথাও গান্ধারীর উপস্থিতি আমরা দেখতে পেলাম না। অথচ তাঁর আগে কুন্তীর পুত্রলাভে তিনি যে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, সে বর্ণনা মহাভারতে বিস্তৃত আছে। ব্যাসদেবের কাছে তিনি সমস্ত হীনতার কথা, সমস্ত পাপের কথা নিজের মুখে স্বীকার করেছেন। তবু সমগ্র জীবন ধরেই একশতাধিক সন্তানের নিঃসঙ্গ মাতা গান্ধারীকে মহাভারতকার মহাভারতের কার্যকারণ সূত্রে বেঁধে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে গেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনকে অনেক সাধু উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু পুত্রস্নেহের কাছে তাঁর বিবেক-বুদ্ধি কখনও জয়ী হয়নি। অন্যদিকে গান্ধারী বরাবরই জানতেন এবং বহুবার অনুভব করেছেন যে, ধর্ম যেখানে জয় সেখানেই। মহাভারতের মূল মন্ত্রটিই ধর্ম। গান্ধারীর বিবেক-বুদ্ধির ক্ষুরণ মহাভারতে একাধিকবার আছে, কিন্তু তিনি নিয়তির কাছে বাঁধা পড়েছিলেন। এই কঠিন নিয়তির বন্ধন আসলে সামাজিক বন্ধন। মানুষের জীবনে নিয়তিবাদকে অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বকে গান্ধারী নিয়তি হিসাবেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পতিকে তথা পুত্রদেরকে অতিক্রম না করার যে প্রতিজ্ঞা মহাভারতের রচয়িতা তাঁকে দিয়ে শুরুতেই করিয়ে নিয়েছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে পুরুষকে অতিক্রম না করার প্রতিজ্ঞা – তথাকথিত সামাজিক শৃঙ্খলকে অতিক্রম না করার প্রতিজ্ঞা। মহাকাব্যের কবি গান্ধারী চরিত্রটিকে দোষে-গুণে গড়ে তুলেছেন। তবু তাঁর চরিত্রের অন্ধকার দিকগুলিতে আলোকপাত করতে গিয়ে আমাদের তাঁর নিয়তি এবং পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনগুলিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মহাভারত গবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর ‘মহাভারতের অষ্টাদশী’ গ্রন্থের ‘গান্ধারী’ শীর্ষক প্রবন্ধে যে মন্তব্যটি করেছেন তা প্রাধান্যযোগ্য –

“আসলে মানুষের জীবনে কতকগুলি ঘটনা নিয়তির মতো নেমে আসে। স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব সেইভাবেই গান্ধারীর ওপরে নেমে এসেছিল বলেই তিনি সেটাকে শেষ পর্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে পাতিব্রত যতখানি কারণ, তার চেয়ে অনেক বড় কারণ গান্ধারীর মানসিক শক্তি, যা তাকে চিরতরে ধৈর্যশালিনী করে রেখেছে। তবু এই অসম্ভব ধৈর্যের মধ্যেও তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস এবং নীতিতে স্থির থাকতে পারেননি এবং তার কারণও তিনি নিজে নন, সেখানেও তাঁর স্বামী আছেন। এ-কথা স্পষ্ট করে সোচ্চারে কোথাও বলেননি মহাভারতের কবি। কিন্তু তাঁর বর্ণনার ক্রম থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীর প্রতি গান্ধারীর আনুগত্যের সুযোগ নিয়েই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নিজের মানসিক বিকারগুলি খানিকটা অন্তত অনুপ্রবিষ্ট করতে পেরেছিলেন গান্ধারীর মধ্যে।”^{১০}

ধর্মপরায়ণা গান্ধারীর স্বামী, ভ্রাতা এবং পুত্রদের দ্বারা যে কপট পাশাখেলা রচিত হয়েছিল সেই প্রতারণার, শঠতার নিবারণে কোথাও কৌরব রাজমাতা গান্ধারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। ব্যাসদেবের বর্ণনা অনুসারে সেই সময়কালে রাজসভায় তিনি ছিলেন না, তবে রাজ-অন্তঃপুরে সেই বিরল পাশাখেলার খবর নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল। বৃহত্তম পটভূমিকায় মহাকাব্যের চরিত্রের গতি ধরে রাখতে মহাকাব্যের কবিকে অনেক জায়গায় নিশ্চুপ থাকতে হয়। গান্ধারীর ক্ষেত্রে বহু জায়গায় নিশ্চুপ থেকেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। পৌরোহিত্য কাহিনি নির্মাণের কৌশলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর স্পষ্ট উপস্থিতির উল্লেখ নেই, তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। অন্যায় দেখেও চুপ করে বসে থেকেছেন তিনি, পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিবাদ এবং ধার্মিক বক্তব্য মহাকাব্যিক পরিমণ্ডলে হীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাভারতে পরের দিকে সারাজীবন ধরে এই উদাসীনতার দায় তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় দুর্যোধনের যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা ইন্দ্রপ্রস্থে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় নিমন্ত্রণে এসে পূর্ণতা লাভ করেছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজধানীতে ময়দানব নির্মিত এক সভাগৃহের বিশিষ্টতা উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি যারপরনাই লাঞ্চিত হন এবং পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর পরিহাসের মধ্য দিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে যান। এরপরই ঈর্ষাপরায়ণ দুর্যোধন মামা শকুনির পরামর্শে পাণ্ডবদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যাজ্ঞসেনীকে চরম লাঞ্চিত করার মনস্থ করে ফেলেন। কপট পাশাখেলায় জয়লাভ করে দুর্যোধন রাজসভায় রজঃস্বলা, একবজ্রা দ্রৌপদীর যে লাঞ্ছনা করেছিলেন, সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও এমন সম্ভ্রান্ত নারীর এই পরিমাণ লাঞ্ছনা ঘটেনি। দ্রৌপদী যথাসম্ভব নিজের অপমান প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন, সরব হয়েছেন। চরিত্রচিত্রশালা মহাভারতে ব্যাসদেব দ্রৌপদী চরিত্রের যে স্বাতন্ত্র্য সমগ্র মহাকাব্য জুড়ে রক্ষা করেছেন তা পাঠককে বিমোহিত করে। কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কৌরব বধূরা সরব হয়েছেন, কুন্তী সরব হয়ে দুঃশাসনের কাছে বারবার ছুটে গিয়ে রাজবধুর সম্মান রক্ষার জন্য কাতর আবেদন করেছেন। শুধু নীরব থেকেছেন গান্ধারী। মাতা গান্ধারীকে মহাভারতের রচয়িতা এইভাবে মহাকাব্যে বহুবার নীরব এবং চিত্রার্পিতের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। অথচ সেই মুহূর্তে আমরা সাধারণ পাঠকেরা সবচেয়ে বেশি তাঁকেই খুঁজছি; কারণ স্বাভাবিক নিয়মে গান্ধারীর সরব হওয়ার প্রয়োজন আমরা সবচাইতে বেশি অনুভব করেছি। হিংসাপরায়ণ, শঠ, দুরাত্মা পুত্রদের কাছে ধর্ম-নিয়ম-নীতি পালনের আবেদন নয়, বরং তাঁদের তীব্র শাসনের প্রয়োজন অনুভব করেছি। কিন্তু বারবারই মহাকাব্যে মহাভারতকার মাতা গান্ধারী, স্ত্রী গান্ধারী এবং নারী গান্ধারীর করুণ অবস্থানটিকে রক্ষা করে গেছেন। পাঞ্চগলীর বস্ত্রহরণের পর প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলার সময়ে বিদুর প্রমুখের সঙ্গে ব্রহ্ম গান্ধারীকে একবার দেখা গেছে। দুটি শ্লোকে সুবলান্নাজা গান্ধারীর উল্লেখ আছে। বাণী বসু তাঁর ‘পাঞ্চগলকন্যা কৃষ্ণা’ উপন্যাসে এই সমগ্র পারিপার্শ্বিকতাকে এবং পাপ ও উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতির সামাল দিতে ধৃতরাষ্ট্রের পাঞ্চগলীকে বরদানের পদক্ষেপটিকে আধুনিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন –

“দুঃশাসন মহা উল্লাসভরে পাঞ্চগলীর বসন ধরে টান মেরেই যাচ্ছে মেরেই যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুর্যোধনের পাঞ্চগলীকে নিজের উরু দেখানো হয়ে গেছে, যেহেতু তাঁর পঞ্চ পতি তাই পাঞ্চগলী বারনারীই কর্ণের এই অপূর্ব উক্তিটিও করা হয়ে গেছে, বিদুর ও বিকর্ণের প্রতিবাদ, ভীমসেনের দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের পাপিষ্ঠ হাতটি পুড়িয়ে দেবার ভীমসেনীয় উদ্যোগ এবং

অর্জুনের তাতে বাধা দেওয়া এসব বাদেও পাঞ্চগলীর কান্না, প্রার্থনা আর ত্রুন্ধ জিজ্ঞাসারও বেশ কয়েক পল অনুপল বয়স হয়ে গেল, দুঃশাসনের হঠাৎ খেয়াল হল, আরে! এ বসন তো ফুরচ্ছে না? ফুরফুরে বসনের স্তূপ, তার মাঝখানে দু'হাত জোড় করে পাঞ্চগলী শ্রীহরিকে ডেকে যাচ্ছেন। দুঃশাসনের হাতে যেন পক্ষাঘাত হল, ভয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়েছে। গোটা সভা বিস্মারিত নেত্রে এই চমৎকার দেখছে। রিপোর্ট শুনে বুড়ো ধৃতরাষ্ট্রের হাড়ে কাঁপন। অগ্নিহোত্র গৃহে একটা শিয়াল চিংকার করে উঠল, গাধা ডাকতে লাগল হ্যাঁকো হ্যাঁকো করে, নানারকম পাখি পাখসাট মেয়ে অপ্রাকৃত চিংকার করতে লাগল। অশুভ বুঝে গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ স্বস্তি স্বস্তি জপ করতে লাগলেন। প্রকৃতির বিকার না দেখলে তাঁদের চৈতন্য হত না? ধৃতরাষ্ট্র ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন – মুঢ় দুর্যোধন, উন্মুক্ত সভায় তুমি ভাইয়েদের ধর্মপত্নীর সঙ্গে এই ব্যবহার করছ, তুমি মরেছ। পাঞ্চগলী, তুমি আমার বধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ধর্মশীলা, সতী, আমার কাছে বর চাও।^{১১}

অতিলোভী জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র যখন এতকিছুর পরেও দ্বিতীয়বার দ্যুতক্রীড়ায় সম্মতি দেন তখন ব্যাসদেব চিরায়ত পৌরুষেয়তার বন্ধনে সুবলনন্দিনীকে আর বদ্ধ করে রাখেননি। মহাভারতের 'সভাপর্ব'-এর শেষে প্রতিবাদী গান্ধারীকে দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘ নীরবতা ভেঙেছেন। বস্তৃত মহাকাব্যের কবির বেদনাবোধ এবং বিচারবোধ উচিত্য অনুযায়ী তাঁর সৃষ্ট সকল চরিত্রের মধ্যেই থাকে। এইখানে মহাভারতে গান্ধারীর স্বকীয় অবস্থানটিকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। সেই কারণেই এতকাল ধরে সন্তানদের সমস্ত অন্যায় সহ্য করা গান্ধারী স্বামী-সন্তানের পাশ থেকে সরে গিয়ে প্রায়ধর্মিতা দ্রৌপদীর অসহায়তায় সমদুঃখী হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনাদির মনোবৃত্তি কতখানি কুৎসিত পর্যায়ে পৌঁছেছে তা তিনি অনুভব করেছেন এবং স্বামীর কাছে গিয়ে দুর্যোধনের জন্মের সময় বিদুর প্রভৃতি ধার্মিকগণের দুর্যোধনকে ত্যাগ করার কথা ও তাঁর দুর্লক্ষণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আসন্ন ভবিষ্যতের শঙ্কায় বলে উঠেছেন –

“মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।

বদ্ধং সেতুং কো নু ভিন্দ্যাদ্ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্।।৫।।”^{১২}

বংশনাশ, যশনাশ, রাজ্যনাশ এবং সর্বোপরি প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানদের জীবননাশের ভয় তখন সুবলান্নাজাকে গ্রাস করেছে। তাপসী গান্ধারীর কাছে অদূর ভবিষ্যৎ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল বলেই তিনি ভয়ে এবং স্নেহে বলে উঠেছেন–

“আপনার পুত্রেরা আপনার প্রদর্শিত পথেই চলুক; তাহারা যেন বিপক্ষের অস্ত্রে বিদীর্ণ হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করে না, অতএব আপনি আমার বাক্যে এই কুলকলঙ্ক দুর্যোধনটাকে ত্যাগ করুন।।৮।।”^{১৩}

গান্ধারীর সরব আবেদন একজন সাধারণ মায়েরই আবেদন। পুত্রের জীবননাশের চেয়ে পুত্রকে ত্যাগ করা ঢের স্বস্তির। মাতা গান্ধারী তখন বিপথগামী পুত্রকে ধর্মপথে আনার প্রচেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মহাভারতের সময়কালে দেশের দুর্বিনীত, স্বেচ্ছাচারী, দাস্তিক চার্বাকপন্থীদের প্রতিমূর্তি হিসাবেই দুর্যোধনকে পাওয়া যায়। চার্বাক মতবাদ অনুযায়ী ইন্দ্রিয়জ সুখই মানুষের জীবনে একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত, কারণ মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। চার্বাকরা পুনর্জন্ম অস্বীকার করে এবং আধ্যাত্মিকতাকে দূরে রেখে ভোগ-লালসায় লিপ্ত থাকার কথা বলে। সেই সময়ে সমাজে নাস্তিক দর্শনের এবং দুর্যোধনের জীবনে চার্বাকের প্রভাব সম্পর্কে অমলেশ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ‘মহাভারতের কথা’ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন –

“মনে হয় তৎকালীন সমাজে চার্বাক মতবাদের বেশ একটা প্রভাব ছিল। চার্বাক ছিলেন দুর্যোধনের বন্ধু। দুর্যোধনের ইহসর্বস্ব ভোগবৃত্তির পিছনে চার্বাকের প্রভাব থাকাই সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই চার্বাককে বধ করা হয়।”^{১৪}

গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্রস্নেহ ত্যাগ করে রাজোচিত বুদ্ধি, ধর্ম ও নীতিপরায়ণ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার অনুনয় জানান। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে এককথায় থামিয়ে দিয়ে বলেন –

“অথাব্রবীন্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিনীম্।

অন্তঃ কামং কুলস্যাস্ত ন শক্লোমি নিবারিতুম।।১১।।

যথেষ্টন্তি তথৈবাস্ত প্রত্যাগচ্ছন্ত পাণ্ডবাঃ।

পুনর্দূতং প্রকুবন্ত মামকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।।১২।।”^{১৫}

অর্থাৎ, তিনি স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন যে, পুত্রেরা যা ইচ্ছে হয় তাই করুক এবং পুনরায় দ্যুতক্রীড়া হোক। বংশ ধ্বংস হলেও তিনি পুত্রদের পুনরায় মহাপাপে নিমজ্জনে বাধা দেবেন না। তারপর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশেই পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে ডাকা হল এবং দ্বিতীয়বার বিনাশক দ্যুতক্রীড়া সম্পন্ন হল। সমগ্র মহাভারতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ এটি। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে থামিয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বর্ষের বনবাস, এক বৎসরের অজ্ঞাতবাস, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, মাতা গান্ধারীর একশত পুত্রের মৃত্যু এবং হৃদয়বিদারক হাহাকারের মহাসূচনা করলেন। গান্ধারী নারী বলেই পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে, প্রধানত স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর আত্মদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা পেল না। কিন্তু যদি এর উল্টোটা ঘটত অর্থাৎ রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে বলতেন পুত্র দুর্য়োধনকে ত্যাগ করার কথা, তবে তা কখনোই আবেদন বা কাতর অনুরোধ হত না। তা আদেশ হিসাবেই প্রতিপন্ন হত – এক্ষেত্রে রাজাদেশ। গান্ধারী মাতা পেতে গ্রহণ করতেন স্বামীর আদেশ। মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা, দুঃখানুভূতি জলাঞ্জলি দিয়ে আবারও নিজেকে পতিব্রতা হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতেন।

পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ এবং অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর অতিবাহিত হলে ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পারেন যে, পাণ্ডবরা পূর্ব নির্ধারিত বচনানুসারে রাজ্য না পেলে সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সঞ্জয় সভাগৃহে গান্ধারীর সম্মুখে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং কৃষ্ণার্জুনের শক্তি-সামর্থ্যের কথা শোনালে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য়োধনকে কৃষ্ণের শরণ নেবার উপদেশ দেন। দুর্য়োধন স্বভাবতই পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন। এরপর অসহায় ধৃতরাষ্ট্র ধর্মজ্ঞা গান্ধারীকে রাজসভায় ডেকে পাঠালেন –

“গান্ধারী উপস্থিত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন – ‘গান্ধারি, শাসনের বহির্ভূত তোমার এই দুরাত্মা পুত্র ঐশ্বর্যের লোভে ঐশ্বর্য ও জীবন হারাইবে। এই অশিষ্ট দুরাত্মা সুহৃদ্বর্গের উপদেশ অমান্য করিয়া সভা হইতে চলিয়া গিয়াছে’।”^{১৬}

শাসন, নিবারণের বাইরে চলে যাওয়া পুত্রদের মর্মান্তিক পরিণতির কারণ স্বার্থান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। যে সময় তাঁর বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হত না, তখন তিনি অশোভন উল্লাসে মত্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ধর্মাত্মা, সর্বদর্শী সঞ্জয় দুর্য়োধনের পক্ষের দুর্বলতা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধৃতরাষ্ট্রের ভালো-মন্দ বিচারের বোধ জাগ্রত হল। এই জাগরণ ছিল ভয়ের এবং আসন্ন মর্মঘাতী পরিণতির। তিনি নিরুপায় হয়ে স্ত্রীর আশ্রয় নিলেন। মায়ের করুণ উপদেশেও দুর্য়োধন টললেন না। গান্ধারীর জীবনে অনর্থক দুর্ভোগ মহাভারতে প্রতি পদে পদে আছে। গান্ধারীর মত ধর্মজ্ঞা নারী তাঁর মনের মতন করে সন্তানদের লালন করে উঠতে পারেননি, তাঁর সন্তানদের অধঃপতনের অন্তরায় হয়ে উঠতে যখন তিনি মরিয়া তখন তাঁর পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁরই স্বামী। আবার দুর্য়োধন শাসন বহির্ভূত হয়ে উঠলে সেই স্বামী তাঁকেই দুঃখে। কোনো এক চিরকালীন অথচ অজানা কারণে অনুকূল সময়ে সন্তান পিতার হয় কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে সন্তান সম্পূর্ণরূপেই মাতার হয়ে ওঠে। সমস্ত পরিস্থিতির দায় মা’কে মাথা পেতে নিতে হয়। মহাকাব্যও পৌরুষেয়তার ধারক ও বাহক এইসব প্রচলিত নিয়মাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সংশয় এবং বৈপরীত্যের মধ্যেই গান্ধারী চরিত্রটি বিকশিত হয়েছে। মহাভারতকার মহাতপস্বিনী সুবলান্নাজাকে অনাড়ম্বর জীবন এবং প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর করেছেন – পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। ধর্মপরায়ণা, পতিব্রতা গান্ধারীর চরিত্রটিকে মহাভারতকার ভালোয়-মন্দয় চিরন্তন এবং মর্মস্পর্শী করে গড়ে তুলেছেন। গান্ধারী প্রসঙ্গে ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর ‘মহাভারতের নারী’ গ্রন্থে যে উল্লেখযোগ্য মন্তব্যটি করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য –

“...পাণ্ডবেরা বনবাস যাত্রা করলে কুন্তী বিদুরের গৃহে বাস করতে থাকলে, গান্ধারী একটি দিনও তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাননি। অথচ কুন্তী তাঁদের তপোবনে বাসের সময়ে স্বেচ্ছায় তাঁর ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবার জন্য বনবাসী হন। বিধাতার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য়োধনের ছিল – সেই অভিযোগ গান্ধারীরও ছিল। স্বামী দৈহিক প্রতিবন্ধকতার কারণে জ্যেষ্ঠ হয়েও সিংহাসন লাভ করেননি।

এই সমস্ত দোষের কারণে প্রাচ্যস্মরণীয় ঋষিরা তাঁকে পঞ্চকন্যার অন্তর্গত করেননি, যাঁদের নাম স্মরণ করলে সব পাপ দূরীভূত হয়।”^{১৭}

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, *প্রবন্ধ সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ মাঘ ১৩৮৮, পৃ. ১২৩
২. দাশগুপ্ত, অশীন, *ইতিহাস ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১২
৩. ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, *মহাভারতম্ (আদিপর্ব ৩)*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ মাঘ ১৩৮৩, পৃ. ১২০১
৪. তদেব, পৃ. ১২০২
৫. *দেশ পত্রিকা*, জয়শ্রী রায় (সম্পাদিত), ৯২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২ জুন ২০২৫, পৃ. ৪৩
৬. ভট্টাচার্য, সুখময়, *মহাভারতের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩১৭
৭. *বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা*, ষোড়সাঁকো নববঙ্গ নাট্যশালা (৮০ নং কলিকাতা প্রেসে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত), কলিকাতা, সন ১২৮০, পৃ. ৮
৮. বসু, বাণী, *ক্ষত্রবধু*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৪২৭, পৃ. ২৫
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ (তৃতীয় খণ্ড)*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৭৬, পৃ. ৬৭১
১০. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ আগস্ট ২০২২, পৃ. ১৭২
১১. বসু, বাণী, *পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৪২৭, পৃ. ১৫৭ - ১৫৮
১২. ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, *মহাভারতম্ (সভাপর্ব ৫)*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃ. ৫৯৪
১৩. তদেব, পৃ. ৫৯৫
১৪. ভট্টাচার্য, অমলেশ, *মহাভারতের কথা*, আর্ঘ্যভারতী, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২৯ শ্রাবণ ১৩৯৭, পৃ. ৬৫
১৫. ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, *মহাভারতম্ (সভাপর্ব ৫)*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা, দ্বিতীয় বিশ্ববাণী সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, পৃ. ৫৯৬
১৬. ভট্টাচার্য, সুখময়, *মহাভারতের চরিতাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ জুলাই ২০১৯, পৃ. ৩২০
১৭. ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, *মহাভারতের নারী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন ২০১৮, পৃ. ৯৯